**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 107-116
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
**DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.087**

# উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি

**মহ: আজাহারউদ্দিন,** *সহকারী শিক্ষক, পার্বতীপুর জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**আসানুর খাতুন,** *গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.04.2026; Accepted: 24.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstarct**

During the first half of the nineteenth century, Muslim women in Bengal lagged significantly behind their Hindu counterparts in every sphere of life. This disparity was primarily attributable to various regressive customs prevalent within the conservative Muslim society of the time—such as the Purdah system, Aborodh (seclusion) practices, child marriage, restrictions on widow remarriage, the Badi (female servitude) system, and the practice of *Talaq* (divorce). This conservative social order imposed numerous restrictions, effectively barring Muslim women from stepping into the outside world. However, beginning in the latter half of the nineteenth century, a number of intellectual women emerged within Muslim society. These educated, intellectual women gradually began to contemplate the emancipation of the women within their own community. Consequently, they subsequently stepped forward to illuminate Muslim society by championing the cause of women's education. The article titled "The Expansion and Progress of Women's Education in Muslim Society in the Nineteenth Century" attempts to demonstrate how, in colonial Bengal, Muslim women themselves emerged from the confines of the Andarmahal (inner quarters) to spearhead the expansion of institutional education within their community. Furthermore, they focused so intently on the transformative changes occurring within traditional Muslim society that they successfully drew women—previously confined to the inner quarters—into the realm of institutional education. Although Islam declares education to be obligatory for both men and women, women had historically been deprived of this fundamental right. Nevertheless, the light of emancipation that began to dawn upon the Muslim female community in the late nineteenth century had education as its primary source; and it was this very education that subsequently laid the foundation for their liberation in both the social and cultural spheres.

**Keywords:** Women's Education, Muslim Society, Organization, Women's Liberation and Rights, Enlightened.

উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে যে আধুনিকতার সূচনা হয় তা বাংলার মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন সাধন করেছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ শিক্ষার ক্ষেত্রে দারুন উন্নতি লাভ করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। স্বসামাজের নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শ্রেণি তাদের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন আসে। দেরিতে হলেও এই সমাজ বুঝতে সক্ষম হয় যে, নারীকে অশিক্ষিত রেখে সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। ঐতিহ্যিক মুসলিম সমাজের পরিবর্তন সমূহ এত গভীর ছিল যে তা

অন্তঃপুরিকাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকে টেনে আনে। মুসলিম নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হয় যে, তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় হল শিক্ষালাভ।

উনিশ শতক জাগরণের শতক, মেয়েদের জীবনে উত্তরণের শতক, প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের মানবতার প্রথম শর্ত হয়ে উঠেছিল নারী মুক্তি। 'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখা হয় -"নারীর যাবতীয় সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার প্রয়োজন, পুরুষের ক্রীড়ানক না ভেবে যোগ্য যোগ্যতর বিকাশের ক্ষেত্র করে দিতে হবে।"[১] কিন্তু সেই ক্ষেত্রে থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল বাংলার মুসলিম মেয়েরা। সেই সময় বাংলার মুসলিম নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় অবরোধ প্রথাকে। একশ্রেণীর রক্ষণশীল মুসলিম নারী শিক্ষার তীব্র বিরোধী ছিলেন। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার্জনকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হলেও মেয়েদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। তবে উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই বেগম রোকেয়া এবং তাহেরুন্নেসার মতো কিছু উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরা চিরাচরিত প্রথা অমান্য করে শিক্ষার পথে পা বাড়ায়। কারণ মুসলিম সমাজের শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষাক্ষেত্রে নর-নারী পার্থক্য নির্দেশ তো করেননি বরং তিনি ঘোষণা করেন—"প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য।" পবিত্র কোরানে যে জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলিম নারীর মতো হিন্দু সমাজেও নারী শিক্ষা মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি পেত না। কারণ ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষানীতিতেও নারীশিক্ষা প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়নি। কারণ ধরে নেওয়া হয় যে, আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার ফলে তাদের মেয়েলী চরিত্রই হারিয়ে ফেলবে। যার ফলে এই শতকে বাঙালি সমাজে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রবল বিতর্ক ও দ্বিধাদ্বন্দ ছিল। সে সময়কার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই তাদের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকে শাস্ত্র বিরোধী বলে মনে করত। ১৮৩৬ সালে বাংলা শিক্ষার অবস্থা প্রসঙ্গে উইলিয়াম অ্যাডাম মন্তব্য করেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নারী শিক্ষার ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল উভয় সম্প্রদায়ই মনে করত যে, মেয়েরা লিখতে পড়তে শিখলে বিয়ের পর বিধবা হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ মনে করত মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করলে পুরুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। এই আশঙ্কায় এদেশীয় লোকেরা নারী শিক্ষা প্রসারে কোনো পদক্ষেপ তো নেননি, উপরন্তু যে-কোনো রকমের মৌলিক জ্ঞান অর্জনে মেয়েদের বাধা দান করেন।[৩] অবশ্য অ্যাডাম অভিজাত হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মেয়েদের গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। তবে তার দৃষ্টান্ত ছিল খুবই কম।

মুসলিম সমাজে মেয়েদের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা সঙ্গত কিনা এ বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকায় অধিকাংশই তাদের বিরোধিতার কথা ব্যক্ত করে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'মিহির ও সুধাকর' যুক্তি দেখায় যে মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিসর বেঁধে দেওয়া উচিত। এই পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় কোরান শিক্ষা এবং উর্দু ও বাংলা ভাষা শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি। 'মিহির ও সুধাকর' এই পত্রিকা দুটি অভিমত ব্যক্ত করে যে মেয়েদের 'ললনা সুহৃদ'-এর মত বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করতে পড়ার ক্ষমতা অবশ্যই থাকা উচিত। যাতে করে তারা গৃহস্থালির কাজ গোছানো, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তানপালন, এবং স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা যত্ন করার মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। উচ্চশিক্ষার দ্বার মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত করার বিরোধিতা করে পত্রিকাটি মেয়েদের মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে। কারণ সেই সময় মনে করা হয় যে, মুসলিম নারীরা শুধুমাত্র

ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেই সমাজের ও পরিবারের উন্নতি ঘটবে। আর তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উচ্চবিত্ত মুসলিম নারীদের মাদ্রাসা শিক্ষার ধীরে-ধীরে প্রচলন ঘটে।

১৯১৯ সালে 'সওগাত' পত্রিকায় নুরুন্নেসা খাতুন 'নারী জাতির শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে ইসলামীয় জ্ঞান বর্জন করে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের মত মুসলমান মেয়েদের মিশনারী স্কুলে গমন করা অনভিপ্রেত, যতদিন না পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করা যাচ্ছে, ততদিন গৃহের মধ্যেই তাদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।[৪] ১৯২৭ সালে রহিমা খাতুন মিলকি 'সওগাত' পত্রিকায় লেখেন – পাশ্চাত্য ধারায় বালক-বালিকাগণ একই সাথে যেভাবে গৃহের বাইরে গিয়ে স্কুলে লেখাপড়া শেখে ঠিক সেভাবে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা দান সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হবে না, কারণ সাধারণ মানুষ মনে করত ইসলামী ধ্যান-ধারণা বর্ণিত শিক্ষা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক।[৫] ঐ একই বছরে বেগম ফাতেমা লোহানী বলেন, "ব্রাহ্ম, ইংরেজ এবং পার্সী মহিলাদের অনুকরণে মুসলিম নারীরা যদি রান্নাবান্না ও গৃহের অন্যান্য কাজে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করে, পড়াশোনা ও খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে গৃহস্বামীরা মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে স্কুলে যোগদান করাকে ভালোভাবে মেনে নেবে না। মেয়েদের উচিত বাড়িতে বসে সেলাই, এমব্রয়ডারি, সূচিশিল্পের কাজ করা এবং সামান্য অর্থ উপার্জন করা।"[৬] ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায় 'স্ত্রী শিক্ষা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে তাহেরউদ্দিন আহমেদ বলেন, মুসলমান মেয়ের শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতি ছেলেদের থেকে পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর অভিমত হল, মুসলিম মেয়েদের সাহিত্য, স্বাস্থ্যবিধি, বিজ্ঞান, গৃহসজ্জা, শিশু পালন, সংগীত, সূচি শিল্পের কাজ, এমব্রয়ডারি প্রভৃতিতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। তুমি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সন্তান প্রসব, শিশুপালন এবং ঘরদোর পরিপাটি রাখাই হল মেয়েদের বি.এ ডিগ্রি এটাই তাঁর প্রকৃত পরীক্ষা।[৭]

উনিশ শতকের শেষের দিকে নারী শিক্ষার বিষয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজের মধ্যে এক ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই শতকের আশির দশকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মীলনী'। এই সংগঠন অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য তখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হতো না। মূলত সেই কারণেই মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলের অর্থানুকূল্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। এরপর বাংলায় মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বেথুন স্কুল ও কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার শুরু হয় ঠিকই, কিন্তু মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার তুলনামূলক বিচারে আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি। কারণ এই সময় বেথুন স্কুলে মুসলিম মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯০১ সালে সিমলা সম্মেলনে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি আলোচিত হয়। সিমলা সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার অনুকরণে স্ত্রী শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা আলেকজান্ডার পোটলার মুসলমান মহিলাদের জন্য মিশন চালু করার সুপারিশ করেন। এই সমস্ত গৃহশিক্ষিকা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা দেবে। প্রতিদানে তারা সরকারের কাছ থেকে ৩০ টাকা বেতন পাবে, ছাত্রীদের কোন বেতন দিতে হবে না।[৮] তবে পরবর্তী পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলায় অনেক গোপন সমিতি করে ওঠে। যার মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বিপ্লবী সমিতির সদস্যগণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। বিপ্লবী লীলা নাগ 'দিপালী সংঘ' গঠন করে মেয়েদের দুরবস্থা মোচনে অগ্রসর হন। ১৯২০ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে এই সংঘ নারী শিক্ষার প্রসারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। লীলা নাগ ১৯২৪ সালে 'কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে অভিজাত পরিবারের অনেক মুসলিম মেয়েরা এখানে ভর্তি হতে শুরু করে।[১০]

বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকে অন্তত দুইজন ব্যক্তিত্ব নারীদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন দূরীকরণে এবং সাধারণভাবে নারী শিক্ষা বিস্তারে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তবে তারা অবশ্য পুরুষ নন, দুজনেই নারী ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন পূর্বতন ত্রিপুরা রাজ্যের, বর্তমানে কুমিল্লা জেলার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। গৃহের পরিবেশের মধ্যেই তাঁর শিক্ষালাভ। বিবাহিত জীবনে স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করলে তিনি বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তখন থেকেই তিনি নিজেকে এবং সমাজের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি স্বগৃহে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য টোল স্থাপন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা, একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং বিশেষ করে মেয়েদের পড়ার জন্য নিজের কুমিল্লা শহরে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আর কুমিল্লা শহরে কলেজ নির্মাণের জন্য তিনি মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেন।

ফয়জুন্নেসা মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মেয়েদের থাকার জন্য তিনি হোস্টেলের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর জমিদারির আয় থেকে মেয়েদের জন্য নির্মিত এই হোস্টেলের ব্যয়ভার বহন করা হতো। মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাসিক বৃত্তিরও তিনি ব্যবস্থা করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যেসময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আব্দুল লতিফ প্রমুখ নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি, সে সময় একজন মুসলিম মহিলা, মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উপমহাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফয়জুন্নেসার এই উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পর ১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হবার ৫৮ বছর আগে নবাব ফয়জুন্নেসা নিজ উদ্যোগে, নিজ জমিদারিতে মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করার দুঃসাহস দেখান। এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তী জীবনে অনেক মহিলা খ্যাতি লাভ করেন। সৈয়দ জাহানারা হায়দার (১৯১৭-১৯৮৮), মেহেরুন্নেসা ইসলাম (জন্ম ১৯২১ সাল) যথাক্রমে ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ সালে এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করেন। স্কুল পরিদর্শক মিঃ গনির কন্যা সৈয়দ জাহানারা ত্রিপুরা জেলার প্রথম মুসলিম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং মেহেরুন্নেসা ছিলেন দ্বিতীয়। এই স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করার পর তাঁরা উভয়েই ঢাকাই ইডেন কলেজে পড়াশোনা করতে যান। পরবর্তীকালে জাহানারা বেথুন কলেজ থেকে এবং মেহেরুন্নেসা কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন থেকে বি. এ পাস করেন। জাহানারা সমাজসেবী হিসেবে খ্যাত লাভ করেন এবং মেহেরুন্নেসা শিক্ষাবিদ হিসেবে সুপরিচিত লাভ করেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় ফয়জুন্নেসা নারী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন।[১১]

সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নবাব ফয়জুন্নেসা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ঠাকুরবাড়ির 'সখি' সমিতির সদস্য ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর 'রূপজালাল' (১৮৭৬), 'তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত' (১৮৮৭), 'সংগীতসার ও সংগীত লহরী' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি স্বকীয়তা ও তেজস্বী গদ্য রচনার পরিচয় দেন। এছাড়া চিকিৎসালয় স্থাপন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তাঁর বিভিন্ন এসব কর্মতৎপরতার জন্য সরকার তাঁকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। তবে তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি জাতির সেবায় উৎসর্গ করেন।

তবে নারী শিক্ষা প্রচার ও নারী বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে জ্বালাময়ী লেখনি হাতে সমাজকে তীব্র কষাঘাত করেছিলেন যিনি তিনি হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বময়ী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯৩২)। ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

তিনি বেশ বুঝতেন যে, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ও তা বৃদ্ধির পূর্ব শর্তই হচ্ছে নারীকে সুশিক্ষিত করে তোলা। রোকেয়া তার গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছেন শিক্ষা কিভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই তিনি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার ব্রতকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সমগ্র সময়কালের শক্তির পিছনে ব্যয় করে নারী শিক্ষার প্রসারতা আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন। তার এই সাহসী ভূমিকায় বাঙালি মুসলিম সমাজ ক্রমে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান প্রশংসার সাথে বারবার মূল্যায়িত হয়েছে। সে যুগে দাঁড়িয়ে রোকেয়া ঠিকই বুঝেছিলেন নারীর মুক্তি নিজেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্জন করতে হবে। আর তার জন্য সবার আগে চাই শিক্ষা, এখানে শিক্ষা মানে কেবল ধর্ম পালন স্বামী ও গুরুজনের সেবা, সন্তান প্রতিপালন কিংবা সংসার পরিচালনার জ্ঞান নয় সত্যিকার জীবন উদ্বোধক শিক্ষা। তাই নারী শিক্ষা বিস্তারকেই তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এই ব্রত পালন করতে গিয়ে সেদিন তাকে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল।

বেগম রোকেয়া জোরালোভাবে নারী শিক্ষা সমর্থন করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমেই নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে। এজন্য মুসলিম নারীদের তিনি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা তাদের মানসিক শক্তি ফিরে পায়। উচ্চ সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। কার্যক্ষেত্রে, সামাজিক উন্নয়নে যেন নারী ভূমিকা রাখতে পারে সে রকম করে গড়ে তোলার দায়িত্ব রোকেয়া গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গের তিনি "Educational Ideals for the Modern India" সূত্র ধরে বলেন,- "Our girls not only obtain University degrees, but must be ideal daughters, wives and instructive mothers."[১২] নারীর মধ্যে কিভাবে আদর্শকে সক্রিয় করে তোলা যায়, তাই ছিল রোকেয়ার প্রতিদিনকার প্রচেষ্টা ও ভাবনা। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। সেখানে রোকেয়া আধুনিক ধারার শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

বেগম রোকেয়া নারী সমাজকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। শিক্ষা বলতে তিনি জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণকে মনে করেননি। 'মতিচুর' গ্রন্থের 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'যাহা হউক শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষর অন্ধ অনুকরণ নহে, ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। এ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অল্প ব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সরল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"[১৩]

বিশ শতকের প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম বাংলার মুসলিম নারী সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি লেখনীর মাধ্যমে সমাজকর্মী রূপে জীবন নিবেদন করেন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৪] দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বেগম রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন যে, নারী জাগরণের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রভাবেই নারী সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হবে, স্বাভাবিকভাবেই সমাজে নারী নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তখন নারীরা প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চার করবে। তাই নারী শিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি নারী শিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তিভিত্তিক মতবাদ প্রচার করেন। এছাড়া নারী শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'

নামে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি স্কুলটিকে একটি আদর্শ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় উন্নীত করার লক্ষ্যে দুই দশকের অধিককাল অক্লান্তভাবে কাজ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[১৫]

বেগম রোকেয়ার শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে তাতে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নতুন নতুন মাত্র স্পষ্ট হয়ে আসে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সামাজিক উত্তরণে তার বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সে সময়কার বাস্তবতার নিরিখে বিস্ময়কর মনে হয়। এছাড়া অবরোধ প্রথাকে তিনি সমাজে নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সবচেয়ে বড় বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন এ বাধার কারণেই বাঙালি সমাজে, বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথ স্থান লাভ করতে পারছে না। সর্বনাশা এ অবরোধের কবল থেকে নারীকে রক্ষা করে সুস্থ ও বলিষ্ঠ এক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রোকেয়া সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

মুসলিম নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন ফজিলাতুন্নেসা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্রশাস্ত্রে মহিলাদের মধ্যে প্রথম এম.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম রমণীদের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত গমন করেন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে তিনি নিজের ক্ষেত্রে যেমন সংগ্রাম করেছেন, তেমনি প্রত্যেক নারীকে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে নিজেদের সার্বিক অবস্থান দৃঢ় করবার আহবান জানিয়ে 'সংগাত' পত্রিকায় বলেছেন –"পুরুষের উপর সর্বকতৃত্বের ভার দিয়ে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নিজেকে মানুষ বলে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে হবে। ভিক্ষুকের মত কেঁদে, পায়ে ধরে, চেয়ে প্রত্যাখ্যান অপমানের পশরা না বয়ে বীরের মতো নিজের ন্যায্য অধিকার জোর করে আদায় করে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা নেই, তাই সাহসও নেই, কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।"[১৬] শিক্ষায় নারী মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, এ প্রসঙ্গে ফজিলাতুন্নেসা বলেন, 'সমাজের দিক দিয়া এবং ব্যক্তির দিক দিয়া ..... নারী শিক্ষা কর্তব্য। শিক্ষা নারীকে ভার- কর্তব্য শিখিয়ে দেবে। স্বাধীনতা তাকে সর্ব্বজনের নিন্দিত কাজে বাধা দেবে'। 'সত্তগাত' পত্রিকার একই সংখ্যায় 'মুসলিম নারীর মূল্য' প্রবন্ধে বলেন, 'নারীর সুশিক্ষিত হয়ে তার অধিকার বুঝে নেওয়ার এবং ভালো মন্দ বিচার করে তদানুসারে চলবার স্বাধীনতা আদায় করে নেয়া উচিত'।

ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারী শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা আস্তে আস্তে দূর হতে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষার্জন ও চাকরিতে প্রবেশের মাধ্যমে পশ্চিমি প্রভাবের সংস্পর্শে আসতে থাকে এবং তাদের সংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজের দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী কেন্দ্রিক সমস্যার ব্যাপারে তারা সচেতন হতে থাকে। নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখার দীর্ঘদিনের প্রথার শক্তিক্ষয় হতে শুরু করে এবং মুসলমানদের পারিবারিক জীবনধারার রূপান্তর ঘটে। মুসলিম মেয়েদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজে অনুভূত হয় এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে দীর্ঘদিনের মনোভাবের উপর আঘাত আসে। অন্দরমহলে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর আসার ফলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের অদম্য আগ্রহ সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু নারী শিক্ষার অগ্রগতি ছিল ধীর ও মন্থর। সাধারণভাবে বলা হয় যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মনোভাব পর্দা ও অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ এবং তৎকালীন ও ঔপনিবেশিক সরকারের উদাসীনতা প্রভৃতি ছিল মুসলিম মেয়েদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পশ্চাদপদতার কারণ নিহিত ছিল অনেক গভীরে সে সময় সামগ্রিকভাবে এদেশীয় মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রসরতার কারণ ব্যাখ্যা করে উইলিয়াম

অ্যাডাম লিখেছেন- "Obstacles true amelioration of women's conditions in this respect were ignorance and superstition on prevailing in native society, the exacting pride and jealousy of the men, the humiliating and accessibility of the women, early marriage, juvenile widowhood, the interdiction of second marriages and consequent vice in degradation."[১৭]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এদেশে নারী শিক্ষার পথ কিছুটা প্রশস্ত করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে দূরে রাখার জন্য সরকার যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে মুসলিম স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রকল্পটি। এই প্রকল্প অনুযায়ী মেয়েদের বিদ্যালয়ে শুধু অঙ্ক এবং যে বিষয় বাড়িতে পড়ার সুযোগ নেই, সেই বিষয় পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়তে পড়াশোনার জন্য মুসলিমদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়। এমনকি মাদ্রাসার সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। ফলে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার সামান্য উন্নতি ঘটে।

১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষা নীতিমালায় ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো নারী শিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে নারী শিক্ষায় সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১-৭২ সালের আগস্ট মাসে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ছাপানো একটি নিবন্ধে দেখানো হয় সেসময় কলকাতায় ১১০ টি সরকারি সাহায্যপুষ্ট এবং ১৪ টি বেসরকারি মহিলা স্কুল ছিল। মোট ছাত্রী ছিল ৩২, তাদের মধ্যে ৮ জন ছিল মুসলমান। 'তিনশত্রিশ' পত্রিকাতে ১৮৮০ সালে মার্চ সংখ্যায় উল্লেখ করে ঢাকা ভে লে তে ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন ছিল মুসলমান। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন বাংলায় নারী শিক্ষার বিষয়ে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। এসব মেয়েদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংস্কার পর্দানশীল মেয়েদের জন্য অন্দরমহলে পড়িয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা, নারী শিক্ষক নিয়োগ, অধিক সংখ্যক স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগ ইত্যাদি প্রস্তাব সরকারের সামনে উপস্থাপন করা হয় যার অধিকাংশ তখন বাস্তবায়ন হয়। আবার ১৯০১ সালে দেখা যায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ১ থেকে ৩ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৫ সালের পর থেকে ইডেন স্কুলে ১২৫ জন এবং ময়মনসিংহের আলেকজান্ডার স্কুলে (বিদ্যাময়ী স্কুলে) ১০০ জন ছাত্রী পড়ালেখা করতো, যাদের অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগে। ফলে এবছর (১৯১১) ইডেনে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৮ জন, যার মধ্যে মুসলমান ছিল ২৫ জন। উল্লেখ্য ছাত্রীর সংখ্যা ১৯০৬ সালে ৩ শতাংশ ছিল এবং ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০ শতাংশ। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় পূর্ব বাংলায় মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা রক্ষা করে মফস্বল এলাকায় স্কুলে পাঠদান করার মত দক্ষ শিক্ষকদের অভাব ছিল। আবার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছিল না, এবং তাদের আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগও অপ্রতুল ছিল। একটি সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়।

Result of Matriculation Examination of East Bengal
(Eden High School, Vidyamandir High School, Dr. Khastagir's High School

| Year | Number of appeared | Number of passed with division | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1st | 2nd | 3rd | Total | |
| 1913 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | Four Secured scholarships are obtained a special scholarship of Rs. 10 |
| 1914 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Two Secured Scholarships |
| 1915 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | Three Secured Scholarships obtained a Special Scholarships Rs. 10 |
| 1916 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | Two Secured Scholarships one obtained a Special Scholarship |
| 1917 | Result not Yet Published | | | | | |


| Year | Number of appeared | Number of passed with division | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1st | 2nd | 3rd | Total | |
| 1913 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | Four Secured scholarships are obtained a special scholarship of Rs. 10 |
| 1914 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Two Secured Scholarships |
| 1915 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | Three Secured Scholarships obtained a Special Scholarships Rs. 10 |
| 1916 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | Two Secured Scholarships one obtained a Special Scholarship |
| 1917 | Result not Yet Published | | | | | |


Source: Quinquennial Report on the Progress of Female Education (1912-13 to 1916-17)

ঔপনিবেশিক বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলিম মেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে তাদের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে ছিল। ব্রহ্ম, দেশীয় খ্রিস্টান এবং হিন্দু মহিলাদের থেকে তারা সাধারণভাবে পিছিয়ে ছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা আদৌ অগ্রসর হতে পারেনি। বিশ শতকের প্রথম দিকে বেশ কিছু হিন্দু মহিলা আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করেছিল, কিন্তু হাতে গোনা দু-একজন ছাড়া এই বিভাগে মুসলিম মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ে না। এ ব্যাপারে দুজন মুসলিম মহিলার নাম করা যেতে পারে। একজনের নাম ইদ্দেন্নেসা বিবি যিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল থেকে মেডিসিন এবং সার্জারিতে ভার্নাকুলার লাইসেন্সিয়েট পাস করেন। ১৯০৩ সালের সরকারি রেকর্ডে তাকে ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী ফিমেল হাসপাতালের বাঙালি মুসলমান লেডি ডাক্তার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর খ্যাতনামা মহিলা হলেন মোসাম্মৎ লতিফুন্নেসা, যিনি ক্যাম্পেবেল মেডিকেল স্কুল পরীক্ষায় ডিস্টিংশন সহ পাশ করেন।

**উপসংহার:**

মেরেডিথ বোর্থউইক উল্লেখ করেছেন, ১৯২০ দশকের আগে কোনো বাঙালি মুসলিম মহিলা বি.এ এবং এম.এ পাস করতে পারেনি, অন্যদিকে কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সালেই এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। খুজিস্তা আখতার বানুই হলেন সম্ভবত প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেন। ফয়জুন্নেসা, ফেরদৌস

মহল, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ তাঁদের পারিবারিক বাধার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। ১৯১৯ সালে ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলের কন্যা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৯২২ বেগম সুলতান মুয়ায়িদজাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২০ দশকে বেগম সাকিনা ফারুক আইনে এম.এ পাস করেন। ১৯২২ সালে ফজিলাতুন্নেসা ফলিত গণিতে এম.এ পাস করেন। সৈয়দা জাহানারা বেগম এবং মেহের সোয়েব ১৯৩৯ সালে বি .এস .সি পরীক্ষায় পাস করেন।

তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি না ঘটলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার যতটুকু বিস্তার ঘটে তার ফলে তাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতাবোধের সঞ্চার হয়। বাংলার মুসলিম সমাজ এই সত্য অনুধাবন করতে সমর্থ্য হয়েছিল যে, মেয়েদের শিক্ষার অধিকার এবং বহির্জগতে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। মুসলিম নারী সমাজের একটা অংশ উপলব্ধি করেছিল যে, শিক্ষা সুগৃহিণী হওয়ার মাধ্যম ছাড়াও তাদের সামাজিক হীনাবস্থা থেকে মুক্তির চাবিকাঠি। কোনো কোনো মহিলা আবার শিক্ষাকে জীবিকা ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতে থাকেন। এসময়ে কিছু মুসলিম সংস্কারক, খ্রিষ্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দু মহিলা স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে আসেন। এই পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে মুসলিম মেয়েরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলে আধুনিকতার পথে পা বাড়ায়।

**তথ্যসূত্র:**


১. কোরান (৪:৯), সুরানিসা: ৪ আরবীতে নিসা শব্দের অর্থ।

২. নুরুল্লাহ, সৈয়দ ও নায়েক জে.পি, হিস্ট্রি অফ এডুকাইটন ইন ইন্ডিয়া ডুয়িং দ্য ব্রিটশ পিরিয়ড, বোম্বে: ম্যাকমিলান, ১৯৪৩, পৃ.২১।

৩. খাতুন, নুরুন্নেসা, 'নারীজাতির শিক্ষা' সওগাত, জয়ষ্ঠ, ১৩২৬, পৃ. ৫২১-৫২২।

৪. বেগম, ফতেয়া লোহানি, নারী সমাজের ধর্ম, সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৪, পৃ. ২৭৪-২৭৬।

৫. আহমেদ, হেরুদ্দিন, স্ত্রীশিক্ষা, সওগাত, কার্তিক, ১৩৩৪, পৃ. ৪৫১-৫১৩।

৬. মিলিক, রহিমা খান, 'মুসলিম নারীশিক্ষার পদ্ধতি', সওগাত, মাঘ, ১৩৩৪, পৃ. ৬৮১।

৭. আমিন, সোনিয়া মিশাল, 'The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939', Leiden & New York: E.J. Brill, Publisher, pp. 161-165.

৮. চক্রবর্তী, রচনা, 'ঔপনিবেশিক কালপরবে নারীশিক্ষা- একটি আলেখ্য, ইতিহাসে নারিশিক্ষা', সুবর্ণ গুপ্ত (সম্পা.), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃ. ১৩৫।

৯. ইসলাম, আমিনুল, 'নবজাগর সীমান্ত বাংলার মুসলিম নারী', কলকাতা: এডুকেশন ফোরাম, ২০২২, পৃ. ১০৫।

১০. আহমেদ, ওয়াকি, 'উনিশ শতকে বাংলার চিন্তা চেতনার খণ্ড', (প্রথম), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ.৯৮।

১১। হোসেন, মিসেস আর এস, 'এডুকেশনাল আইডিয়ালস ফর দ্য মডারেন ইন্ডিয়ান গার্ল, দ্য মুসলিম', ভলিউম। XXV, TW Edition, Vol.VII, মার্চ 5, 1931, No 26, P-7।

১২.গম রোকেয়া, 'সাখাওয়াত হোসেন: চিন্তা চেতনারধারা ও সমাজ কর্ম', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

১৩। খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'সাহিত্য ও আর্ট', মাসিক মোহাম্মদী, আগ্রহ, ১৩৩৫।

১৪. মুসলিম নারীমুক্তি, সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৬।

১৫। হোসেন, মিসেস আর এস, এডুকেশনাল আইডিয়ালস ফর দ্য মডারেন ইন্ডিয়ান গার্ল, দ্য মুসলমান, ভলিউম। XXV, TW Edition, Vol.VII, মার্চ 5, 1931, No 26, P-7।

১৬। আহমেদ, সুফিয়া, বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়, 1884-1912, ঢাকা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, 1974, পৃ. 399।

১৭। 1912-1913 থেকে 1916-1917-এর জন্য ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের নারী শিক্ষার অগ্রগতির কুইনিয়াল রিপোর্ট', কলকাতা: *বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাট, 1918, পৃ.5।*